মোহ। সেইজন্যই সে বইখানা

দিল।

লুকিয়ে পড়তে পড়তে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়ল বড়ো অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনলে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় বটে— কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ-কথা লেখা আছে, সে পড়ে দেখল। পারদের গুণ বর্ণনা করতে করতে লেখক লিখেছেন,— শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরে কয়েকদিন রোদে রাখতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরে মানুষ ইচ্ছে করলে শূন্যমার্গে যেমন ইচ্ছে বিচরণ করতে পারে!

অপু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না,—আবার পড়ল—আবার পড়ল। পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকিয়ে রেখে বাইরে গিয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে অবাক হয়ে গেল।

দিদিকে জিজ্ঞেস করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি? তার দিদি বলতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীপু, কিনু, পটল,

নেড়া—সকলকে জিজ্ঞেস করে! কেউ বলে—সে এখানে নয়, উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়! তার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস। অপু ঘরে ঢুকে শোবার ভান করে ও বইখানা খুলে সেই জায়গাটা আবার পড়ে দেখে। আশ্চর্য! এত সহজে উড়বার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কারও বাড়ি নেই, শুধু তার বাবারই আছে, হয়তো এই জায়গাটা আর কেউ পড়ে দেখেনি, শুধু তারই চোখে পড়েছে এতদিনে।

পারদের জন্য ভাবনা নেই— পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পিছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, সেটা সে জোগাড় করতে পারবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় কী করে পায়?

সন্ধান অবশেষে মিলল। হীরু নাপিতের কাঁঠাল-তলায় রাখালরা গরু বেঁধে গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনতে যায়। অপু গিয়ে তাদের পাড়ার রাখালকে বলল— তোরা কত মাঠে-মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস, আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাদের বাড়ির সামনে এসে তাকে ডেকে কোমরের থলি থেকে দুটো কালো রঙের ছোটো-ছোটো ডিম বের করে বলল—এই দ্যাখো ঠাকুর, এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি! পরে আহ্লাদের সঙ্গে নেড়েচেড়ে বলল—শকুনির ডিম!—ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি-ভুরি প্রমাণ উত্থাপন করল। এটা শকুনির ডিম কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করে কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল থেকে এটা সংগ্রহ করে এনেছে, কিন্তু দুটি দু'আনার কমে দেবে না।

শ্রমিক শুনে অপু অন্ধকার দেখল। বলল—দুটো পয়সা দেব, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, একটা টিনের কৌটো ভর্তি সব।